OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 243*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 237 - 243*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848*

# মহাশ্বেতা দেবীর ‘হুলমাহা’ : ভারতীয়ত্বের অনুসন্ধান

আমিনুর মিঞা
গবেষক, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: aminurm.dta@gmail.com
0009-0006-5242-5416

***Received Date*** *28. 09. 2025*
***Selection Date*** *15. 10. 2025*

***Keyword***
*Indianness. Equality. Casteism. Secularism. Unity. Sacrifice. Solidarity. Forced labor.*

***Abstract***
*Mahashweta Devi’s widespread influence in literature. Not only in Bengal, but also in regions outside Bengal like Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, etc., her influence is vast. Her literature naturally features the existence of deprived, vulnerable people who are denied social, economic and political rights. With a compassionate heart, she reached the homes, doors, and innermost hearts of the oppressed, governed, exploited, weak, marginalized, and helpless people in society. The novel ‘Hulmaha’ (1982) is a testament to this exceptional life and work. The burning story of the Santal rebellion is the main subject of its narrative. Under the rule, exploitation, and oppression of the colonial, zamindari, and moneylender classes, the Santal community was in danger and lost its way. Under their rule and exploitation, the tribals lost their freedom, rights, and the honor and dignity of their women. The exploitative class created its own empire by taking advantage of the Santals weakness and helplessness. There, burdened with debt, the Santals were reduced to bonded labor and serfdom. Additionally, Santals faced various forms of social and economic oppression and exploitation. To escape this oppression and exploitation, they initiated a rebellion. The main goal of the rebellion was to establish an independent Santal kingdom. Sidhu and Kanu led the rebellion. ‘Damin-i-Koh’ was formed across the vast regions of Bhagalpur, Murshidabad, and Birbhum. Besides the Santal community of these areas, Santals from Hazaribagh and Manbhum also joined this rebellion. Not only people from the Santal community, but also the oppressed and exploited Shabar, Munda, and lower-caste Hindus participated in this rebellion. Everyone’s dream was that their lives would be free from any company, government, zamindar, owner, or moneylender’s oppression and exploitation. Everyone, all classes, all castes, especially the Santal community, aimed to live together in unity. In this way, Mahashweta Devi has woven various contexts and tendencies of Indianness into the layers of her novels. In her narratives, the eternal national tradition and the taste and dream of Indianness are directly or indirectly revealed. She sought to establish that all people in India are equal and everyone has equal rights. Her thoughts and methods of work are solely aimed at destroying inequality and establishing equality. She did not accept caste discrimination and racial disparities. Her narratives contain a*

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 243*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

*call for unity or oneness to protect one's own caste, religion, race, language, culture, and above all, the existence of the country. Mahashweta Devi has tried to highlight this through various narratives. From this perspective, every Indian citizen can feel the subtle pulse of life in Mahashweta Devi's novel 'Hulmaha'.*

## Discussion

প্রবন্ধটি পাঠ করার প্রথমেই ভারতীয়ত্ব কী? ভারতীয়ত্ব বলতে কী বোঝায়— সে সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক। কেননা ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে একটু ধারণা না থাকলে প্রবন্ধ পাঠে বিশেষ ফল লাভ সম্ভব নয়। তবে ভারতীয়ত্ব বিষয়টি সহজসাধ্য বিষয় নয়। কেননা ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যময় একটি দেশ। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে যেমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই বৈচিত্র্যতা লক্ষ করা যায়। এদেশে প্রায় ১৫০ কোটি মানুষের বসবাস। এদেশে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, বিভিন্ন আদিবাসী মানুষের একত্র বসবাস এবং প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর মানুষে মধ্যে রয়েছে ভিন্ন ধর্ম ও আদর্শগত চিন্তা-ভাবনা। এখানে বিভিন্ন ভাষা-উপভাষার মানুষের সহাবস্থান। প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে রয়েছে নিজস্ব জীবন-জীবিকা-ইতিহাস-ঐতিহ্য তথা আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, পাল-পার্বণ-প্রথা, সংস্কার-বিশ্বাস ইত্যাদি সাংস্কৃতিক দিক থেকে ব্যাপক পার্থক্য— ফলে ভারতীয়ত্বের বিষয়টি পরিস্ফুট করা দুরূহ ব্যাপার। আর বৈজ্ঞানিক ভাবেও ভারতীয়ত্বের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই, যেখানে এই বিষয়টি সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে। তবুও দেশ-কাল-সমাজ সচেতনশীল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মনীষী, মহান ব্যক্তিবর্গ, আদর্শ পুরুষ, জাতীয় নায়ক ভারতীয়ত্বের ধারণা উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তারা বলেতে চেয়েছেন— যে উপলব্ধি ভারতবাসীর অন্তর্লোকে উপলব্ধি হয় তাই ভারতীয়ত্ব। অর্থাৎ ভারতবাসীর মানসলোকের যে সাংস্কৃতিক মনগত অভিপ্রায় প্রাত্যহিক জীবনের দ্বায়, দ্বায়িত্ব, কর্তব্যের কথা স্মরণ করে দেয়, ভবিষ্যৎ জীবনের যাত্রাপথের পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করে, মানুষে মানুষে জাতিগত-ধর্মগত ভেদাভেদ ভুলে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনে একে অপরকে আপন করে নেয়, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করে, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যভাব গড়ে তোলে, পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং ত্যাগ, বীরত্ব, ক্ষমা, সংযম, উদারতা, সহনশীলতায় মানবিক গুণাবলি প্রকাশ করে, সেটাই ভারতীয়ত্ব।

কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ সচেতন এবং প্রখর অনুভূতিশীল। একজন লেখক হিসাবে সমাজের ও দেশের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন দায়বদ্ধ শিল্পী। সেই দায়বদ্ধতা, নিজস্ব শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যপূর্ণ পরিবারে বেড়ে ওঠা মহাশ্বেতা দেবী গভীর অনুভূতি ও সহানুভূতিশীল মন নিয়ে দেখেছেন অনুন্নত অধিকার বঞ্চিত ভারত তথা হতদরিদ্র ভারতবাসীকে। তিনি আধুনিক শিক্ষিতা, সংস্কৃতিমনস্কা, জনকল্যাণকামী, উদার মানবিক দৃষ্টিকোণের অধিকারী ছিলেন। প্রকৃত অর্থে দেশ বলতে বুঝেছেন গ্রাম বাংলা তথা গ্রামের সাধারণ জীবন। যেখানে দারিদ্র্য, শাসন, শোষণ, বঞ্চনা থাকে তাদের নিত্যসঙ্গী। লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সাংবাদিকতার সূত্রে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেছেন, যেমন-পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি। প্রাবন্ধিক-সমালোচক নির্মল ঘোষ বলেছেন—

> "একদা নেহাৎ বেড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি ঘুরেছেন পালামৌ, হাজারিবাগ, রাঁচি প্রভৃতি বিহারের বিস্তীর্ণাঞ্চল। তাঁর সাহিত্যে সেই পটভূমি বারংবার ফিরে এসেছে। বিহার যেন তাঁর প্রকৃত স্বদেশ। শুধু বাংলা, বিহারই নয়, সমস্ত ভারতই তাঁর সাহিত্যের পটভূমি; তাই তিনি কোনও অর্থেই বাঙালী লেখক নন, ভারতীয়ত্বই তাঁর প্রকৃত পরিচয়।"[১]

মহাশ্বেতা দেবীর চিন্তা-চেতনা-কর্ম ও সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে সেই ভারতীয়ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মূলত যেখানে স্থান পেয়েছে অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত, মেহনতি মানুষের বাস্তব জীবন আলেখ্য। নিত্য শোষণ ও বঞ্চনা যাদের নিত্যসঙ্গী এবং জীবনের অগ্রপথে প্রধান বাঁধা। মহাশ্বেতা দেবী সহানুভূতিশীল মন নিয়ে উদার চিত্তে সকলের পাশে

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 243*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

দাঁড়িয়েছেন, সকলের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন। নিপীড়িত মানুষের জীবন যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছেন, যা হৃদয়কে অস্থির করে তুলেছে। ফলত, তাদের জীবনের প্রতিভাষ্য সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। তাদের জীবনের রূপ দিতে গিয়ে তিনি ভারতের ইতিহাস ও সমকালীন সময়, সমাজ ও সংস্কৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। প্রখ্যাত সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় মতে—

> "ইতিহাসের জন্যই ঐতিহাসিক-অনুসন্ধান মহাশ্বেতার প্রখরভাবে সজীব ও সৃজনশীল মনকে আটকে রাখতে পারেনি। এই অনুসন্ধানের পথে চলতে চলতেই তিনি এক নতুন লক্ষ্য এবং নতুন পথের সন্ধান পেয়ে গেলেন। ভারতবর্ষের চির-চেনা ইতিহাস আর্যজাতির ইতিহাস, রাজারাজড়ার ইতিহাস, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ইতিহাস, উচ্চবর্গের ইতিহাস। তুর্কি আক্রমণের পরেও, মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাস মূলত উচ্চবর্গের ইতিহাস। কিন্তু মন্দগতি অলক্ষিত অবহেলিত আর এক ভারতবর্ষও আছে, তার দিকে আমাদের কোনদিনই দৃষ্টি পড়ে নি। সে হল নিম্নবর্গের ভারত, তারা দলিত ও শোষিত নিম্নবর্গের ভারতের একটা বড়ো অংশ—আদিবাসী বা ট্রাইব্যাল ভারত, জনজাতির ভারত। অর্থাৎ মহাশ্বেতার সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় সবটাই এই আদিবাসী এলাকাতেই নিবদ্ধ। এই এলাকাই তাঁর সৃজনশীলতার নির্বাচিত ভূমি।"[২]

মহাশ্বেতা দেবী সেই নিম্নবর্গের ভারত, অবহেলিত, শোষিত, নিপীড়িত ভারতবর্ষের আদিবাসী সাঁওতাল জনজাতির জীবন-জীবিকা-ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও সংগ্রামকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে 'হুলমাহা' (১৯৮২) উপন্যাস রচনা করেছেন। আখ্যানে সাঁওতাল জনসমাজের জীবন, সংগ্রাম ও বিদ্রোহের পটভূমিতে প্রধান আলোচ্য বিষয়। আখ্যানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে চিরায়ত জাতীয় ঐতিহ্য তথা ভারতীয়ত্বের স্বাদ ও স্বপ্ন। ভারতের সকল মানুষ সমান এবং প্রত্যেকের সমান অধিকার আছে তা তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাঁর চিন্তা ও কর্ম প্রণালী মাত্রই অসাম্য ধ্বংস করে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা। তিনি জাতিভেদ ও বর্ণগত অসঙ্গতি মেনে নিতেন না। তাঁর আখ্যানে নিজস্ব জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, সর্বোপরি দেশের অস্তিত্ব রক্ষায় ঐক্যবোধ বা একাত্মতার আহ্বান রয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক মাত্রই প্রাণের সুক্ষ্ম স্পন্দন অনুভব করতে পারে 'হুলমাহা' উপন্যাসে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই বিদ্রোহ সাঁওতাল জনসমাজের কাছে 'হুল' নামে পরিচিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক, নীলকর, জমিদার, মহাজন ও মালিক শ্রেণির শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে স্বাধীন সাঁওতাল রাজ প্রতিষ্ঠা এই বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুবে বাংলার দেওয়ানি লাভ করলে তারা রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকের উপর রাজস্বের বোঝা বাড়াতে থাকে। রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিব্যবস্থার রূপান্তর ঘটে এবং লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন।

> "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি গ্রহণের পর থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকদের মধ্যে একে একে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দেয়। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, চুয়ার বিদ্রোহ, পাইক বিদ্রোহ, তিতুমীরের নেতৃত্বে ফরাজি বিদ্রোহ, দুদু মিঞার নেতৃত্বে সংগঠিত ওয়াহাবি আন্দোলন প্রভৃতি একত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সুবে বাংলার বিভিন্ন স্থানে জনজাতীয় কৃষকদের অনেক বিদ্রোহ ওই সময়কালে সংঘঠিত হয়েছে।"[৩]

তার মধ্যে 'দামিন-ই-কোহ'তে সংঘঠিত সাঁওতাল বিদ্রোহ অন্যতম। ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে 'দামিন-ই-কোহ' গঠিত। এই সব অঞ্চলের সাঁওতাল জনজাতি ছাড়াও হাজারিবাগ, মানভূমের সাঁওতালরাও এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। শধু সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষ নয় শোষিত, নিপীড়িত শবর, মুণ্ডা ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল।

আখ্যানে পরিলক্ষিত হয় নগিনদাসের মতো মালিকেরা সাঁওতালদের সামান্য ঋণ দিয়ে বছরের পর বছর তাদের বাঁধাবেগারে পরিণত করে। তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকে ঋণ শোধের পালা। পিপলা গ্রামের ধনরাম টুডু

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 243*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

নগিনদাসের কাছ থেকে তিন টাকা ধার নিয়েছিল। তারপর সে দীর্ঘ সাত বছর বেগার খেটেছে। তাতেও তার ঋণ পরিশোধ হয় না। প্রতিবছর ধনরামের পিতা ধান-কুরথি-অড়হর বয়ে নিয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু তবুও ঋণ শোধ হয় না। বাঁধা বেগাররা যাতে পালাতে না পারে তার জন্য মালিকেরা পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখে। পায়ের বেড়ি মাংস কেটে বসে গেলেও বেগাররা মুক্তি পায় না। ধনরামের পায়েও বেড়ি পড়ানো থাকে। অসহ্য অত্যাচার সহ্য করে সে সাত বছর পর পালিয়ে যায়। ভগনাডির সিদু তাকে নিজের বাড়িতে এনে বেড়ি কেটে দেয়। তার পায়ের বেড়ি মাংস কেটে বসে গেছে দেখে রাম সমবেদনা জানায় এবং তাদের সমাজের সকলের অত্যাচারিত, নিপীড়িত রূপ বহিঃপ্রকাশ করে—

> "মানুষ কোথায়? এ তো সাঁওতাল! তায় বান্ধাবেগার। তাতে বেড়ি দেয়। আমাদের সবারই পায়ে বেড়ি রে সিদু! কোনটা দেখা যায়, কোনটা দেখি না।"[৪]

সীমাহীন অত্যাচার সহ্য করতে না পেয়ে বাঁধাবেগাররা পালিয়ে গেলেও তার পরিবারের নিস্তার নেই। জমিদার বেগারদের পরিবর্তে তাদের পিতা বা ছেলেদের ধরে নিয়ে এসে বান্ধাবেগারে পরিণত করে। নগিনদাসের পেয়াদারা বাণগড়ের জমিদারের পাইকদের সঙ্গে নিয়ে ধনরামকে ধরতে গিয়েছিল। কিন্তু ধনরামকে না পেয়ে তার ভাই ও বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সিদুরা প্রতিবাদ করে। সাতজন পেয়াদা ও পাইকদের লাঠি কেড়ে নেয়, তাদের মেরে তাড়িয়ে দেয়। সিদু জানে এর শেষ নেই। তারা চলে গেলে পাইক পেয়াদা পুনরায় আসবে। সিদু তাই পিপলা বাসীদের সচেতন করে ও সাহস জোগাতে দিয়ে বলে—

> "আবার এলে মেরে খেদাবে। আনন্দ পরে ক'রো। বিপদে আমরা হাকচাক খেয়ে যাই। যেন চোখে ধুলো-পড়া হরিণ, এমনই দিশাহারা হই। বিপদ কাটলে তখনি নাচ-গান-হাঁড়িয়া নিয়ে মেতে উঠি। এতেই আমরা মরতে বসেছি। তারা এলে বলবে, যে পালিয়েছে, তাকে ধর গা। এরা ধার নেয়নি, বেগার দেয়নি, পলায়নি। এদেরকে ধরতে দিব না।"[৫]

শুধু মালিকের অত্যাচার ও শোষণ নয়, বারহাইতে সিদু-কানুর সঙ্গে হিন্দু ব্যবসায়ী মহাজনদের নিত্য বিবাদ হয়—

> "ওজন নিয়ে, 'শালোমালো' সম্বোধন নিয়ে, সাঁওতাল মেয়েদের দিকে তাকানো নিয়ে।"[৬]

তারপরে আছে সহজ সরল আদিবাসী সাঁওতালদের উপর আড়কাটির চক্রান্ত। তারা নিয়ে যায় রেলের কুলির কাজে, চা-বাগানের কাজে। তারা অনেক প্রলোভন দেখায়— সেখানে দিকু নাই, সাহেব নাই, হপ্তা গেলে টাকা। সেখানকার মাটিতে চাষ করলে ভাল ধান ফলে। ফলে তাদের অনেকে চলে যায় অচেনা জায়গায়। কেননা সাঁইথিয়া থেকে কহলগাঁও, বারহারোয়া হতে দেওঘর, দিকে দিকে সাঁওতালদের পায়ে শিকল, বাঁধাবেগার। তারা এই জীবন থেকে মুক্তির সন্ধান করে।

সাঁওতালদের উপর শোষণের মাত্রা প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে। মহেশপুর, পাকুর, বারহাইত, মিছাপুর, আমড়াতলা ইত্যাদি এলাকার চাষিরা ধান ও কর্জের টাকা জীবনেও শোধ করতে পারে না। মহাজনেরা ভাদ্রমাসে অভাবের দিনে সাঁওতাল গ্রামে ঘুরে ঘুরে ধান ও টাকা কর্জ দেয়। কিন্তু ধান ফেরত নেওয়ার সময় কখনো ওজনের সঠিক হিসাব শোনায় না। ফলে প্রত্যেক বছর ধান ও কর্জের টাকা বাকি পড়ে থাকে। জমিদারও তাদের বাঁধাবেগার হিসাবে রেখে দেয়। ফলে বাপ বেগার খেটে মরে যায়, ছেলে এসে বাপের ঋণ শোধ করতে, তারপর আসে তার ছেলে। এভাবে বংশ পরম্পরা বেগার প্রথা চলতেই থাকে। জীবনে কখনো ঋণের দায় থেকে মুক্তি পায় না। পায় না স্বাধীন মুক্ত জীবনের আস্বাদ। বারহাইতের বাজারে হাজার হাজার মানুষ আসে। নগিনদাসের আড়তে এসে চাষিরা কর্জের ধান পরিশোধ করে। নগিনদাসের কয়াল ধান ওজন করে। সাঁওতাল চাষি মঙ্গলা সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারে কর্জ তার শোধ হল না। কপালে অশেষ দুঃখ আছে। কিন্তু পিছন থেকে চাঁদ মুর্মু প্রতিবাদ করে—

> "ওজন ঠিক হয় নাই হে কয়াল! ...কয়ালের ওজনে এক গাড়ি ধানে দেখি দশ সের হয়। ভাল রে ভাল! তা নগিনদাসবাবু! আমরা এই একশত সাঁওতাল মাথাপিছু দুই মণ করে ধান করজ নিব আর কয়ালের

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 243*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> ওজনে নিব। এক গাড়িতে দশ সের। চার গাড়িতে এক মণ, আট গাড়িতে দুই মণ, কেমন? দিবে তো? না দিলে ছাড়ব না।”[৭]

সাঁওতালদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। নগিনদাস যে লোহারের কাছ থেকে বাটখারা নেয়, চাঁদও সেখান থেকে বাটখারা নিয়েছে। ফলে হিসাবের গরমিল সে বুঝতে পায়। সে মঙ্গলার ধান ফিরিয়ে দেয় এবং সবাইকে জানিয়ে দেয় এরপর হাটে নয়, গ্রামে বসেই মহাজনের ধান শোধ করার কথা। নগিনদাস চাঁদকে শাসিয়ে বলে—

> “কোম্পানির রাজ্যে বাস করিস চাঁদ মুর্মু! আমার জাতের লোক দারোগা-পুলিশ-পেয়াদা-মুনশি। এ অপমানের শোধ আমি তুলব।”[৮]

মহাজন, জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারে সাঁওতালদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে যায়। সিদু কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে লছিমপুর চলে যায়। সেখানকার পরগনাইত বীরসিং মাঝির কাছে জানতে পারে তাদের সমাজের অবস্থা। সেখানকার হড়হপনের ধান জাতে ঘরে ঘরে থাকে, কেউ যাতে বাঁধাবেগার না হয়, সে জন্য সকলে জোট বাঁধে। হাতে তীর ধনুক, নিজেরা বাটখারার ওজনে পাথর আনে, পাল্লা তৈরি করে, মহাজন ও তার লোকদের আমল দেওয়া বন্ধ করে, মেয়েদের দিকে চাইলে রেগে ওঠে। ফলে এ সময়ে বিভিন্ন গ্রামে ডাকাতি পড়ে। মহাজনেরা বাঙালি, বিহারী ভুলে একজোট হয়ে থানায় গিয়েও আশানুরূপ ফল পায় না, চলে যায় পাকুড়ের জমিদারের কাছে। জমিদার বীরসিংয়ের জরিমানা করলে বীরসিংরা জরিমানা দেয় না। ফলে পরগনাইত বীরসিংকে সকলের সামনে জুতা মারা করে। তারপর থেকে তারা পাকুড়ের সব মহাজনদের ধান লুঠ করে বিলাতে শুরু করে। ক্রমে সিদুরা লিটিপাড়া গিয়ে জানতে পারে সেখানে মহাজন কেনারাম ভকত ও মহেশ দারোগাকে মারলে সাঁওতালরা রাহু মুক্ত হবে। কিন্তু সিদু বুঝতে পারে একটা মহাজন, জমিদার বা পুলিশকে মারলেই এই শোষণ থেকে তারা মুক্তি পাবে না। কেননা—

> “হায়রে ভাইগণ! তাই কি হয়? এ কোম্পানির শাসনে দামিনের জমিনে কেনারাম আর মহেশদের বীজ বুনা আছে। একটা যাবে তো আরটা জন্মাবে। কোম্পানিতে জমিদারে-মহাজনে বিয়া বসেছে। কোম্পানি স্বামী, জমিদার-মহাজন তার দুই বউ। আমলা, গোমস্তা, পেয়াদা, কারকুন, আমিন, নায়েব, পুলিশ, তার ছেলের পাল। কোম্পানির ছোটভাই নীলকর সাহেব। এ সকল বীজ উখরাইতে পার তো দেহ হতে বিষ নামি যায়।”[৯]

সিদু বিশাস করে এই বিরাট শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারা ডোম, কামার, লোহারদের সাথে পাবে। কেননা তারাও তাদের মতো দুখী। সিদুরা সাঁওতাল দেশ স্বাধীনের চিন্তা ভাবনা শুরু করে। অপেক্ষা করে থাকে ঠাকুরের আদেশের। এমন করে চারিদিকে সাঁওতালদের চাপা তুষানলের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোটলাট হ্যালিডে ও বড়লাট ডালহোসি এসবে কিছু আমল দেয়নি। কখনো শোনেনি নাগরার গম্ভীর ও ভীষণ আওয়াজ। তারা জানে দামিন-ই-কোহ শান্তিতে আছে। সাঁওতালদের অবস্থা নিশ্চয় ভাল। নাহলে মাত্র তেরো বছরে দামিন থেকে সরকার দুই হাজারের জায়গায় তেতাল্লিশ হাজার টাকা খাজনা পায় কি করে? কোন জমিদার, কোন নায়েব, কোন নীলকর সাঁওতালদের নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু ভগনাডির সিদু মুর্মুর সাহস বেড়েছে তা মহাজন, নায়েবেরা বুঝতে পেয়েছে। নগিনদাস সিদুর নামে মহেশ দারোগার কাছে নালিশ করতে গিয়েছে। ধূর্ত বাঙালি ব্যবসায়ী-মহাজন-নায়েব দারোগার সাহায্যে সাঁওতালদের যখন আদালতে নেয় সাঁওতালরা দেখে তাদের জন্য কোন বিচার নেই আদালতে। সে সময় দামিনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পটেন্ট ছিলেন দামিনের প্রধান মাথা। তিনি খাজনা বাড়ালে জমিদারের গোমস্তা তার দ্বিগুণ টাকা আদায় করেছিল। ফলে তারা মহাজনের কাছে ধার দেনা করছিল। একথা পটেন্টকে জানিয়েও কোন ফল হয় না। সাঁওতালরা জমিদার ও মহাজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রাম থেকে চাঁদা তুলে দুজন মোক্তার নিযুক্ত করে। কিন্তু পরে বুঝতে পারে মোক্তার ও দারোগার গলায় গলায় মিল। উভয়ে চাঁদার টাকা আত্মসাৎ করে। সাঁওতালদের এসভ্যতা চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। তারা বুঝতে পারে—

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 243*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

> "এ সভ্যতা মানে কর্ণওয়ালিশ-সৃষ্ট জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীর অচলায়তন। এ সভ্যতার আরেক নাম কেনারাম ভকতের জাল বাটখারা, নগিনদাসের বেগার পাট্টা। এ সভ্যতার মানে ভাগলপুরের রক্তচোষা বাঙালি উকিল, দিঘিতে মহেশ দারোগা। এ সভ্যতার মানে আড়কাঠি, মদের দোকান, মেয়েদের ইজ্জত লুঠ, জমিজমা লুটেপুটে একটা জাতকে ভিখারি বানানো।"[১০]

ফলে আদিবাসীরা সমাজ অন্তরে উপলব্ধি করে এই শোষণ থেকে মুক্তি দরকার, স্বাধীন সাঁওতালরাজ গঠনের জন্য তাদের না মেরে উপায় নেই। সিদু অন্তরে ঠাকুরের হুলের ডাক অনুভব করে। উপলব্ধি করে বিপ্লবের। ১২৬২ সনের আষাঢ়ে শালগিরার আহ্বান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভগনাডিতে হুলের আগুন জ্বলেছে বলে চারিদিকের সাঁওতালরা ভগনাডি আসতে শুরু করে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন বৃহস্পতিবার ভগনাডি গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বের মাঠে এক প্রাচীন ও বিশাল বটগাছের সামনে হাজার হাজার সাঁওতাল জমায়েত হয়। শুধু দামিন নয়, বীরভূম, ভাগলপুর, হাজারিবাগ, মানভূম থেকেও সাঁওতালরা আসে। যারা জমিদারের প্রয়োজনে মানভূম, হাজারিবাগ, মালদা, পূর্ণিয়ায় গিয়েছিল, যারা নীলকুঠির ডাকে গিয়েছিল, বর্ধমান-রানীগঞ্জে রেলের কুলি, কয়লাখাদানে কাজ করতে গিয়েছিল–সবাই ফিরে আসছিল। সুবা ঠাকুর সিদু-কানু সাঁওতাল জাতির প্রাচীন ইতিহাস, তিলকা মাঝির প্রসঙ্গ ইত্যাদি নানা কথা তুলে ধরে। প্রশ্ন করে হড়হপন অর্থাৎ মানব সমাজ তথা সাঁওতাল জনগণ আজ নিজ দামিনে ভিখিরি কেন? তাদের জাতে অবিশ্বাস নেই, মিথ্যা কথা নেই। বিজয় মাঝি বারো ঝুড়ি ধান নিয়ে একশো ঝুড়ি ধান দেয়, তারপরে তার সবকিছুই ক্রোক করে, জেলে ভরে দেয়। এ রকম শত শত বিজয় মাঝির সর্বনাশ করে। 'ছোটবৌ' বাটখারায় দেয়, 'বড়োবৌ' বাটখারায় নেয়। ঋণ শোধ না হলে বেঠবেগার, কামিয়া করে রাখে। মেয়েদের ইজ্জত নেয়। জমিদার তার আমলা ও গোমস্তা, মহাজন ও ব্যবসায়ী, আড়কাঠি ও নীলকুর সকলে মিলে সাঁওতালদের জীবনে যে অভিশাপ বহন করে আনে সেই কোম্পানি সরকার শুধু খাজনা বোঝে। তারা বলে কোম্পানির রাজ্যে অবিচার নেই, তাহলে থানা-পুলিশ-দারোগা এমন জুলুম করে কেন? আদালতে বাঙালি উকিল মুহুরী তাদের রক্ত খায়, হাকিম জুলুম বাজদের ছেড়ে দেয়, সাঁওতালদের ছেড়ে দেয়। তাই তারা আর নয়, এখন সকল দিকু, সাহেবের উচ্ছেদ চায়, সাঁওতাল দেশে সাঁওতালরাজ গঠন করতে চায়। তাদের কাছে বাঙালি আর পশ্চিমা সকলেই দিকু। সাঁওতালরা তাদের দেশে যায় না, তাদের বেগার খাটায় না, মা-বোন-মেয়েদের ইজ্জত লুটে না। তাহলে তারা কেন সাঁওতালদের উপর এরূপ আচরণ করবে। শুধু সাঁওতাল নয়, কুমার, কামার, তেলি, মোমিন, ডোম— সকলের উপর দিকুরা এই অত্যাচার চালায়। সিদু তাই সকলের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে—

> "তোমরা শুনেছ যে আমি ঠাকুরের আদেশ পেয়েছি। হ্যাঁ, পেয়েছি। ঠাকুর বলেছে, সকল জুলুমবাজকে উচ্ছেদ করো, সাঁওতালরাজ কায়েম করো, দেলায়া বিরিদ্ পে, দেলায়া তিঙ্গুন পে। সে জন্য ঠাকুরের আদেশে আমি হুল-এর ডাক দিলাম।"[১১]

হুল, হুল চিৎকারে গর্জে উঠে হাজার হাজার সাঁওতাল। শুরু হয়ে যায় হুল-এর লড়াই। প্রায় ত্রিশ হাজার সাঁওতালকে নিয়ে যাত্রা এগিয়ে চলে। ডুগডুগি, দুমদুমি, ধামসা, নাগরা, মাদল ইত্যাদি বাদ্য-বাজনার তালে তালে তারা এগিয়ে চলে। অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে টাঙি আর তির-ধনুক। কামিয়া-বাঁধাবেগারদের মুক্ত করে এগিয়ে চলে। মারতে থাকে জমিদার, মহাজন, আমিন, গোমস্তা, পাইক, নীলকুঠিয়ালদের। ডোম, তেলি, কামার, কুমোর, তাদের সাহায্য করে। সাহেবদের গতিবিধির খবর দিয়ে সাহায্য গোয়ালারা। গ্রামের উচ্চজাতেরা যারা এতকাল ডোম, কামার, কুমোরকে নীচু জাত বলে খেদাত, সবাইকে তারা শাস্তি দেয়। হ্যালিডে বিদ্রোহ দমনে আর্মি পাঠায়। সেনাদের বন্দুকের সামনে সাঁওতালরা প্রথমদিকে জয়ী হলেও টলমেইনের মৃত্যুর পর সেনারা 'রক্ত-আগুন ও আতঙ্ক' নীতি গ্রহণ করে। ভাগলপুরের কমিশনার মার্শাল ল ঘোষণা করে। সিদু-কানুর মাথা দশ হাজার, অন্য নেতা পাঁচ হাজার, নীচের সারির নেতার মাথা হাজার টাকা। সামরিক বাহিনীর বন্দুকের সামনে তির-ধনুকের লড়াই খুব কঠিন হয়ে যায়। সাঁওতালরা পরাজিত হয়ে যায়। একে একে সিদু ও কানু ধরা পড়ে। ১৮৫৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে কানু ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে বলে ওঠে—

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 26*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 237 - 243*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

"আবার আমি আসব, ফিরে আসব, আবার, আবার আসব।"[১২]

সিদু-কানু নিজে যেমন ছিলেন নিরীহ, নিপীড়িত মানুষ, তেমনি তারা বঞ্চিত, শোষিত মানুষের সঙ্গের সাথী। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। স্বাধীন সাঁওতালরাজ গঠন করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ জনমত গঠন করেছে। সমাজে ন্যায়, ন্যায্যতা, সমতার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছে। মানুষের মধ্যে চেতনার জাগরণ ঘটিয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। পরকে আপন করে নিজের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছে, সকলের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে, প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন দেশ ও জাতীর জাতীয় ঐতিহ্য তথা ভারতীয়ত্বকে।

মহাশ্বেতা দেবীর বিশ্বাস পরাজয়ে কখনো বিদ্রোহ দমন হয় না। তিনি তাই পুনরায় বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিয়ে উপন্যাস শেষ করেন। তিনি সাঁওতাল জনসমাজের ওপর অত্যাচার ও শোষণের ভয়ংকর রূপ তুলে ধরেছেন। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন দেশ, জাতি, সমাজের জন্য সাঁওতালদের বীরত্ব, ত্যাগ, জাতপাত নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ঐক্যবোধ ও একাত্মতা। সাঁওতালদের এই বীরত্ব, ত্যাগ, একাত্মতা, সংঘবদ্ধ জীবন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং স্বাধীন সাঁতালরাজ প্রতিষ্ঠার প্রেরণার মধ্যে ভারতীয়ত্ব ধরে পড়ে। এভাবে মহাশ্বেতা দেবী 'হুলমাহা' উপন্যাসে ভারতীয়ত্বের ধারা ও ধারাবাহিকতা, ভারতবর্ষীয় সমস্ত শ্রেণির মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, অসাম্য দূর করে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা, ঐক্যভাব বজায় রাখতে কলমের মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন ইংরেজ শাসক-শোষক, জমিদার, জোতদার, মহাজন, মালিক ও প্রশাসনের অন্যায়, অসাম্য, ভেদ-বিভেদ, রীতিনীতি, আচরণের বিরুদ্ধে। পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছেন দেশ ও জাতীর জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আদর্শ চিন্তা-চেতনা তথা ভারতীয়ত্ব।

## Reference:

১. ঘোষ, নির্মল. মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ. করুণা প্রকাশনী. কলকাতা. ১৯৯৮. পৃ. ২১
২. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ. বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা. দে'জ পাবলিশিং. কলকাতা. ২০১৫. পৃ. ৩১৩
৩. চৌধুরি, অরুণ. আদিবাসী জীবন ও সংগ্রাম. গাঙচিল. কলকাতা. ২০১৩. পৃ. ১১
৪. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.). মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র-১১. দে'জ পাবলিশিং. কলকাতা. ২০১৪. পৃ. ৮০
৫. তদেব. পৃ. ৮৩
৬. তদেব. পৃ. ৮৩
৭. তদেব. পৃ. ৮৭
৮. তদেব. পৃ. ৮৮
৯. তদেব. পৃ. ৯০
১০. তদেব. পৃ. ৯২
১১. তদেব. পৃ. ৯৭
১২. তদেব. পৃ. ১৩৯